সৈনিকতা ও কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যকর্ম

মোহাম্মদ আজম*

প্রস্তাব

নজরুল-জীবনীকার ও আলোচকদের প্রায় সকলেই একমত পোষণ করেন, সৈনিক জীবন নজরুলের সাহিত্যকর্মে অপরিমেয় প্রভাব রেখে গেছে। তাঁরা মূলত নজর দিয়েছেন কবিজীবনের সূত্রপাত, বাইরের পৃথিবী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন, বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যচর্চা ইত্যাদি জীবনীমূলক উপাদানের দিকে। এ লেখায় সৈনিকবৃত্তির ভাবগত তাৎপর্যের দিকেই প্রধানত মনোযোগ দেয়া হবে, এবং নজরুলের সামগ্রিক সাহিত্যকর্মে এর ব্যাপক-গভীর প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে।

উপনিবেশ আমল ও উপনিবেশ-উত্তর বাংলা সাহিত্যের পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে যেসব নন্দনতাত্ত্বিক মাপকাঠি ব্যবহৃত হয়েছে এবং এই ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের ভূগোল যেভাবে চিহ্নিত হয়েছে, তার সীমায় নজরুল সাহিত্যের কিছু পৌনঃপুনিক উপাদান ঠিকমত আঁটে না। সৈনিকতা এমনি একটি ধারণা। বলা যায়, মধ্যবিত্ত সাহিত্যচর্চার বলয়ের মধ্যে এ ক্ষেত্রে পূর্বাপর ধারাবাহিকতা অনুপস্থিত থাকায় ধারণাটি পর্যাপ্ত মনোযোগ পায়নি। এ প্রবন্ধে সৈনিকতাকে হাজির করা হবে নজরুল সাহিত্যের অন্যতম প্রধান চাবিধারণা হিসাবে, আর এই নিরিখে পাঠ করা হবে তাঁর সাহিত্যকর্মের গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ।

১

১৯১৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে কাজী নজরুল ইসলাম '৪৯ নং বাঙালি পল্টনে যোগ দিতে করাচি যান (আবদুল ১৯৮৯ : ২)। সৈন্যদলে প্রভূত কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়ে তিনি স্বল্পকালের মধ্যেই 'ব্যাটালিয়ান কোয়ার্টার-মাস্টার হাবিলদার' পদে উন্নীত হয়েছিলেন এবং সৈন্যদলের রসদভাণ্ডারের তত্ত্বাবধানের ভার পেয়েছিলেন (আবদুল ১৯৮৯ : ২৫)। নানা সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে নিশ্চয় করে বলা যায়, নজরুল তাঁর এই চাকরিটি উপভোগ করতেন। মর্যাদার ব্যাপার বলেও মনে করতেন। করাচি সেনানিবাস থেকে কলকাতায় যেসব লেখা পাঠাতেন সেগুলিতে লেখা থাকত — হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম (আজহার ১৯৯৭ : ১৬)। তাঁর লেখালেখিতে সৈনিক হওয়ার উচ্ছ্বাস গোপন থাকেনি, অন্যদের বয়ানেও আমরা সংবাদটি বারবার পেয়েছি।

ব্রিটিশবিরোধী কবি ব্রিটিশ পক্ষের সৈনিক হয়ে কাজ করতে গেলেন কেন, বা এর মধ্যে কোনো স্ববিরোধ আছে কিনা — এ প্রশ্ন উঠেছে, এবং প্রশ্নটা অমূলক নয়। তবে বাঙালির সৈনিক হওয়া সম্পর্কিত সমকালীন ডিসকোর্সে চোখ বুলালে বোঝা যায়, ব্যাপারটা

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মোটেই অত সরল-সোজা ছিল না। বাঙালিদের সেনাবাহিনীতে না নেয়ার একটা জোরালো মত শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে ছিল। এর এক কারণ বাঙালির দৈহিক গড়ন আর মনোবৃত্তি সম্পর্কিত নেতিবাচক মনোভাব। অন্য কারণ সমকালীন তরুণসমাজের ব্যাপক হারে সন্ত্রাসবাদে দীক্ষা নেয়া। কলকাতার ভদ্রলোকশ্রেণি এসব কথা মাথায় রেখে বাঙালি পল্টন গড়ার পক্ষে তৎপরতা চালিয়েছিল। যেমন, ইংরেজি দৈনিক 'অমৃতবাজারে'র এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বাঙালির সৈনিকবৃত্তির অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে তথ্যউপাত্ত পেশ করে এ পেশায় তাদের দক্ষতার নজির দেখানো হয় (শেখ দরবার ১৯৮৮ : ৮৩)। সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে একটা জনপ্রিয় মত ছিল এমন যে, বেকার তরুণদের চাকরি পাবার মধ্য দিয়ে এবং সৈনিক জীবনের শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে বাঙালি তরুণরা ব্রিটিশ সরকারের অনুগত খাদেমে পরিণত হবে (শেখ দরবার ১৯৮৮ : ৮৪)। ইংরেজদের পক্ষ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সাহায্যের বিনিময়ে ভারতকে স্বাধীনতা দানের প্রতিশ্রুতিও ছিল।

এ বাস্তবতায় বাঙালি পল্টন নিয়ে সার্বিকভাবে বাঙালি মধ্যবিত্তের আগ্রহ ছিল তুঙ্গে। দেশের নেতৃবৃন্দ বাংলার যুবকদের যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হওয়ার জন্য যুদ্ধে যোগদানের আহ্বান জানিয়েছিলেন। এই নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'বাঙালী পল্টনের গান' নামে একটি কবিতা লিখে 'প্রবাসী'র ১৩২৪ ভাদ্র সংখ্যায় ছাপেন (আজহার ১৯৯৭ : ১৪)। বাঙালি পল্টনদের কলকাতার টাউনহলে বিপুলভাবে সংবর্ধনা দেয়া হয়। শুধু কলকাতায় নয়, পথে যেতে যেতে বহু জায়গায় তাঁরা অভিনন্দিত হয়েছিলেন (আজহার ১৯৯৭ : ১৪)।

জীবনীকাররা নজরুলের নিজের দিক থেকে যুদ্ধে যাবার কারণ খুঁজেছেন। যেমন, *রিক্তের বেদন* গ্রন্থের চরিত্রগুলোর আবেগ-অনুভূতি পরীক্ষা করে আবদুল কাদির লিখেছেন : 'এসকল চরিত্রে নজরুলের নিজের জীবনের ছায়া পড়েছে এবং তাদের এ ধরনের নানা উক্তি থেকে বুঝা যায় যে নজরুল একটা রোমান্টিক খেয়ালের বশে যুদ্ধে যোগ দেননি; বাঙালীর ভীরুতা অপবাদ অপনোদন এবং বিজ্ঞানসম্মত সামরিক শিক্ষালাভের সেই প্রথম সুযোগের সদ্ব্যবহার, এই দুই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি যুদ্ধের জীবন-মরণ খেলায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন' (আবদুল ১৯৮৯ : ৯২)। মাহবুব হাসান খেয়াল করেছেন, কিশোর বয়সে বিপ্লবী নিবারণ ঘটকের সান্নিধ্যে এসে নজরুল যেমন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, ঠিক তেমনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন সশস্ত্র বিপ্লবের প্রতিও। অসম্ভব নয় যে, এ কাজে নিজেকে প্রস্তুত করবার জন্য তিনি এন্ট্রান্স পরীক্ষা ফেলে সৈনিকের চাকরি নিয়েছিলেন (মাহবুব ১৯৯৭ : ৩৫)।

এঁদের এসব সিদ্ধান্তের পক্ষে একটা বাস্তব ভিত্তি হয়ত এই যে, পল্টনে যোগ দেয়ার সময় নজরুল ছাত্র ছিলেন, বলা যায় — ক্লাসে প্রথম হতেন যেহেতু — ভালো ছাত্র ছিলেন। ফলে ঐ কালের মাপে মধ্যবিত্ত জীবনের একটা প্রাথমিক নিশ্চয়তা তাঁর ছিল। তবু তিনি বেছে নিয়েছিলেন সৈনিকের জীবন। কিন্তু এসব ব্যাপারে নিশ্চয় করে কিছু বলা কঠিন। হতে পারে নজরুল গিয়েছিলেন নিতান্তই খেয়ালের বশে, হতে পারে তাঁর উড়নচণ্ডি স্বভাবের টানে, কিংবা দারিদ্র্য বা অন্য কোনো তাৎক্ষণিক অসুবিধা এড়াতে। কারণ যাই হোক না কেন, একথা নিশ্চিত করে বলা যায়, সৈনিকবৃত্তিকে নজরুল গ্রহণ করেছিলেন পরম সন্তোষে; আর এ থেকেই ছেনে নিয়েছিলেন তাঁর জীবন ও সাহিত্যকর্মের সবচেয়ে কার্যকর রূপকল্প।

২.১

১৯২০ সালের মার্চ মাসে ৪৯ নং বেঙ্গলি রেজিমেন্ট ভেঙে দেয়া হলে নজরুল করাচি থেকে কলকাতায় চলে আসেন (রফিকুল ১৯৮২ : ৩৫)। ফলে তাঁর সৈনিক জীবন মোটামুটি বছর তিনেকের। দৈর্ঘ্যে খুব লম্বা না হলেও সময়টা তাঁর ব্যক্তিগত ও সাহিত্যিক জীবনে, দেখা যাচ্ছে, ফলপ্রসূ হয়েছিল। কলকাতায় ফেরার পরও অনেকদিন তিনি হাবিলদার পদবি ব্যবহার করেছিলেন। আর কবিজীবনের প্রথম দিকে বেশ কিছু দিন তাঁর পরিচিতিও হয়েছিল 'হাবিলদার কবি' বা 'সৈনিক কবি' হিসাবে (মুস্তাফা ১৯৮৩ : সাত)।

সৈনিক জীবন থেকে তাঁর প্রথম লাভ ভিন্ন জগতের মানুষ ও পরিবেশের সাথে পরিচয়। এ জীবন নজরুলকে বাংলাদেশের প্রাদেশিক গণ্ডি ছাড়িয়ে সর্বভারতীয় এমনকি মধ্যপ্রাচ্যের পটভূমিকায় স্থাপন করে (রফিকুল ১৯৮২ : ৩৩)। প্রামাণ্য জীবনীকারদের অধিকাংশই একমত পোষণ করেন, নজরুল যোদ্ধা হিসাবে মেসোপটেমিয়ায় যাননি। কিন্তু একই সাথে তাঁরা এও বলেছেন, করাচির ঐ সেনানিবাসেই একটা বহুজাতিক আবহ ছিল। নিজের উৎসাহে পত্রপত্রিকা আর বইপুস্তকের জোগানও তিনি নিয়মিত পেতেন। আর পেতেন মধ্যপ্রাচ্যের খবর — ভাষার বেশে, সাহিত্যের বেশে, মানুষের বেশে। *রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ* বইয়ের মুখবন্ধে তিনি লিখেছিলেন : 'আমি তখন স্কুল পালিয়ে যুদ্ধে গেছি। সে আজ ইংরেজি ১৯১৭ সালের কথা। সেইখানে প্রথম আমার হাফিজের সাথে পরিচয় হয়। আমাদের বাঙালী পল্টনে একজন পাঞ্জাবী মৌলবী থাকতেন। একদিন তিনি *দীওয়ান-ই-হাফিজ* থেকে কতকগুলি কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। শুনে আমি এমনি মুগ্ধ হয়ে যাই, যে, সেইদিন থেকেই তাঁর কাছে ফার্সি ভাষা শিখতে আরম্ভ করি। তাঁরই কাছে ক্রমে ফার্সি কবিদের প্রায় সমস্ত বিখ্যাত কাব্যই পড়ে ফেলি'। এ থেকে বোঝা যায়, নজরুল হয়ত সশরীর মধ্যপ্রাচ্যে যাননি, কিন্তু ঐ বিরাট অঞ্চলের মানসিক ঐশ্বর্যের ভাগী হয়েছিলেন ভাষা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়ে। নজরুলের সাহিত্যকর্মের একেবারে আকর উপাদান হিসাবে আরবি-ফারসি-তুর্কি উপকরণের বহুলতা তাই কেবল তাঁর ইসলাম ধর্মাবলম্বী হওয়া দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না; ব্যক্তিগত ইতিহাস ও প্রস্তুতির ইতিবৃত্তকেও আমলে আনতে হবে।

২.২

নজরুলের সৈনিকজীবনের সাথে তাঁর সাহিত্যিকজীবনের এক প্রত্যক্ষ সম্পর্ক এই যে, কলকাতার পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রথম রচনাগুচ্ছ এ সময়েই লেখা। এ সময়ের গল্প 'হেনা', 'ব্যথার দান' ইত্যাদিতে একজন সৈনিককে পরিষ্কার পড়া যায়। এ লেখক নিজে সৈনিক, সৈনিকতা তাঁর কাছে একদিকে উপভোগ্য কাজ, অন্যদিকে দেশ ও দশের বৃহত্তর কল্যাণের সাথে যুক্ত। তাঁর প্রথম গ্রন্থ *ব্যথার দান*-এর কোনো কোনো গল্প নতুন আবহ তৈরির সাফল্যে প্রশংসিত হয়েছিল। এ আবহ যুদ্ধের আবহ। 'বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'র মাঘ ১৩২৯ সংখ্যায় *ব্যথার দান*-এর সমালোচনায় লেখা হয়েছিল : 'কোন কোন গল্পে যুদ্ধক্ষেত্রের যেরূপ উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা বাংলা সাহিত্যে যেমন নতুন, তেমনই সৌন্দর্যপূর্ণ' (মুস্তাফা ১৯৮৩ : ২৪)।

সৈনিকজীবনের স্মৃতি তাজা থাকতে থাকতে লেখা আরো অনেক রচনায় আমরা এরূপ 'উজ্জ্বল চিত্র' পেয়েছি। এর শ্রেষ্ঠ নমুনা বোধ করি 'কামাল পাশা' কবিতা।

'কামাল পাশা' বাংলা সাহিত্যের এক অতুলনীয় নাট্যকাব্য। পুরোপুরি বাস্তবসম্মত আবহ তৈরি করে ছন্দ-সুর-শব্দের নিখুঁত লীলায় কবিতাটি এক স্মরণীয় নান্দনিক সৃষ্টি। নজরুল সমালোচকদের অনেকেই — যেমন রফিকুল ইসলাম — এ কবিতার মোটামুটি নির্ভরযোগ্য ভাষ্য তৈরি করেছেন (রফিকুল ১৯৮২ : ৩৩৬-৪২)। আমরা এ মুহূর্তে কবিতাটি পড়তে চাই কেবল সৈনিকবৃত্তির সাথে নজরুলের একাত্মতার নিগূঢ় নমুনা হিসাবে।

কামাল পাশা নজরুলের কাছে সবসময়ের জন্য এক আদর্শ বীর। কামাল সেই নেতার সাক্ষাৎ মূর্তি, যার আগমন-প্রত্যাশায় নজরুল রচেছেন বহু আন্তরিক আকৃতি। এ কবিতায়ও কামাল পাশার নেতৃত্বের সৌরভ প্রকটিত হয়েছে। কিন্তু প্রধান হয়ে উঠেছে লড়াকু বীর সৈনিকেরাই, যারা সত্য ও ন্যায়ের সমরে সর্বদাই নির্ভীক। এরা সৈনিকের ন্যায় সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, কর্তব্য পালনে অকুতোভয়। প্রতিপক্ষের অনৈতিক অবস্থান সম্পর্কেও সুনিশ্চিত :

হিংসুটে ঐ জীবগুলো ভাই নাম ডুবালে সৈনিকের,
তাই তারা আজ নেস্ত-নাবুদ, আমরা মোটেই হইনি জের!
পরের মুলুক লুট করে খায় ডাকাত তারা ডাকাত!
তাই তাদের তরে বরাদ্দ ভাই আঘাত শুধু আঘাত!

এ সৈন্যদলের ফূর্তি তাই শুধু যুদ্ধজয় নয়, আরো বড় কিছু। বন্দী মানুষকে আজাদ করা এবং অধীন দেশ স্বাধীন করার মতো বৃহৎ-মহৎ কারণের সাথে তা যুক্ত। তাই তাদের উল্লাসের এই জোয়ার। মোটেই ব্যক্তিগত নয় এ উল্লাস, বরং অন্তর্গত আবেগের দিক থেকেই সামষ্টিক। ঠিক সৈন্যদলের মতোই সামষ্টিক। একই সাথে তারা বেদনার রক্তেও রঞ্জিত। তাদের কেউ কেউ আহত হয়েছে, কেউ নিহত। কিন্তু সৈনিক হিসাবে মৃত্যুও তাদের কাছে বীরত্ব বৈকি :

সাচ্চা ছিল সৈন্য যারা শহীদ হল মরে।
তোদের মতন পিঠ ফেরেনি প্রাণটা হাতে করে, –
ওরা শহীদ হল মরে! ...
খুন দেখেছিস্ বীরের? হা দেখ্ টকটকে লাল কেমন গরম তাজা!
মুর্দারা সব যা যা!!

আবার এই মৃত সৈনিকদের জন্য শোক প্রকাশ করতে গিয়েই কবি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে একাকার করে নিয়েছেন সৈনিকজীবনের সাথে। সমষ্টির মধ্যেই আবিষ্কার করেছেন ব্যক্তি সৈনিককে। সামষ্টিকতা ক্ষুণ্ন না করেই, দুই দিক থেকে। এক. কবি বিলাপ করেছেন তাদের জন্য, যারা জীবনের শুরুতে, আমোদ-আহ্লাদের কোনো অভিলাষ পুরা হওয়ার আগেই, হারিয়ে গেল জীবন থেকে। নারীসঙ্গবঞ্চনা সেকালের সৈনিকজীবনের সাধারণ বাস্তবতা। ফলে বিবাহিত জীবন, স্ত্রীসঙ্গ আর সংসার তাদের পরম আকাঙ্ক্ষার ধন।

সন্ধ্যাকালের আরেকটি সাধারণ বাস্তবতা হল 'অস্ত-রবির আশ্চর্য রঙের খেলা'। এ দুই সাধারণ বাস্তবতা ব্যবহার করে নজরুল সৈনিকের আশা-আকাঙ্ক্ষা, বেদনা আর কল্পনাকে চিহ্নিত করেছেন কয়েকটি অসাধারণ চিত্রকল্পে। দুই. সৈনিকদের মৃত্যুতে ভদ্রলোকশ্রেণির প্রতিক্রিয়ার ধরনকে তীব্র ব্যঙ্গে আক্রমণ করেছেন, যেখানে সৈনিকের শ্রেণি-অবস্থান পরিষ্কারভাবে ধরা পড়েছে :

তাই যত আজ লিখ্‌নে-ওয়ালা তোদের মরণ ফুর্তি-সে জোর লেখে!
এক লাইনে দশ হাজারের মৃত্যু-কথা! হাসি রকম দেখে!
মরলে কুকুর ওদের, ওরা শহীদ-গাথার বই লেখে!
খবর বেরোয় দৈনিকে,
আর একটি কথায় দুঃখ জানান, 'জোর মরেছে দশটা হাজার সৈনিকে'!

'কামাল পাশা' কবিতায় যুদ্ধের কাব্যিক প্রকাশ প্রথম থেকেই পাঠক-সমালোচকের নজর কেড়েছে, প্রশংসিতও হয়েছে। 'বিজলী' পত্রিকার ৬ জানুয়ারি ১৯২২ সংখ্যায় 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে : 'কবিতাটি যুদ্ধের 'মার্চে'র ছন্দে গাঁথা। এরূপ কবিতা বোধহয় বাংলার কাব্যসাহিত্যে এই প্রথম' (মুস্তাফা ১৯৮৩ : ৮)। এরকম শনাক্তির নজির বিস্তর পাওয়া যায়। কিন্তু কবিতাটিতে স্বয়ং সৈনিক হয়ে সৈনিকদলের সাথে লীন হয়ে যাবার যে বাস্তবতা, তা বাংলা সমালোচনাসাহিত্যে বিশেষ প্রচলিত হয় নাই। আমাদের বিবেচনায়, নজরুলের বহু রচনার তীব্রতা, অন্তরঙ্গতা আর কেজো ভঙ্গির আস্বাদনে সংবাদটি খুব জরুরি ভূমিকা রাখবে।

২.৩

তার এক কারণ, ব্যক্তি সৈনিকের ব্যক্তিগত সক্রিয়তা নজরুলের পরবর্তী কর্মধারা এবং সাহিত্যকর্মে একাকার হয়ে গেছে। মুজফফর আহমদ জানিয়েছেন, বাংলার কৃষক-শ্রমিকদের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন 'লেবর স্বরাজ পার্টি'র প্রথম গঠনপ্রণালি, প্রোগ্রাম ও পলিসি ১৯২৫ সালের পয়লা নভেম্বর তারিখেই ৩৭ হ্যারিসন রোড (এখন নাম মহাত্মা গান্ধী রোড) হতে কাজী নজরুল ইসলামের স্বাক্ষরে প্রকাশিত হয়েছিল (উদ্ধৃত, আতাউর ১৯৯৭ : ১৫৬)। তাঁর সম্পাদিত পত্রপত্রিকার সাথে বিপ্লবী দলগুলোর যোগাযোগ কোনো কাকতালীয় ব্যাপার নয়। বস্তুত ১৯২৩-২৪ খ্রিষ্টাব্দে যে বাংলাদেশে আবার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন দেখা দেয় তার পেছনে নজরুলের 'ধূমকেতু'র যথেষ্ট অবদান ছিল (রফিকুল ১৯৮২ : ৯১)। প্রশ্ন হলো, কোনো বিপ্লবী দলের সভ্য না হয়েও কোন গুণে তিনি বিপ্লবীদের মুখপাত্র এবং আশ্রয়স্থল হয়ে উঠলেন? এ প্রশ্নের একটা ছায়া-জবাব পাওয়া যাবে 'অমৃতবাজার' পত্রিকার ৩০ আগস্ট ১৯২২ সংখ্যায়। এক রিভিউ নিবন্ধে পত্রিকাটি লিখেছে : The articles from the editorial pen in the 'Dhumketu' fully sustain the reputation of the soldier-poet and the collections he has been able to make are in tune with the fire and energy of his own writings. (মুস্তাফা ১৯৮৩ : ১১-১২)। বোঝা যায়, নজরুলের লেখার তেজ ও তাপ-ভাঁপকে ব্যক্তি-লেখকের অতীত ও বর্তমান সৈনিকবৃত্তির সাথে মিলিয়ে পড়েছেন এই নিবন্ধকার।

সমকালের আরো বহু প্রতিক্রিয়ায় নজরুল পাঠের এই রেওয়াজ বহাল ছিল। পরবর্তীকালে, সম্ভবত প্রভাবশালী নন্দনতত্ত্বের অনুদার সংকীর্ণতাহেতু, পাঠের এ রীতি দুর্বল হয়ে পড়ে।

সম্ভবত নজরুলই বাংলা সাহিত্যের একমাত্র ব্যক্তিত্ব যাঁর পূর্ণ সামরিক জীবন যাপনের অভিজ্ঞতা ছিল। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে বেশ কজন সাহিত্যিক অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু বিস্ময়করভাবে তাঁদের রচনায় যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ছবি প্রায় অনুপস্থিত। সরাসরি যুদ্ধে অংশ না নিলেও, যাকে বলে war poetry বা যুদ্ধের কবিতা, তার কিছু নমুনা নজরুলের রচনাতেই মেলে। অভিজ্ঞতার সাথে অন্তর্গত বেগ-আবেগের সম্মিলনই এর কারণ। যুদ্ধের নৃশংসতা বা হতাশা তাঁকে স্পর্শ করেনি। তিনি একে রূপান্তরিত করেছিলেন তেজোদ্দীপ্ত আশাবাদে। তাই তাঁর পক্ষে বিপুল জনগোষ্ঠীর আকূতিকে লেখায় ধারণ করা সম্ভব হয়েছিল ।

৩

নজরুলের লেখালেখিতে তাঁর সাহিত্যতত্ত্বের ধারাবাহিক ও বিশদ পরিচয় পাওয়া যায় না। অবশ্য 'আমার কৈফিয়ত'-এর মতো দুর্দান্ত স্বীকারোক্তিমূলক কবিতা কিংবা বহু গদ্যরচনা থেকে নিজের লেখা সম্পর্কে তাঁর সুচেতন অবস্থানের পরিচয় মেলে। এসব রচনায় — যেমন 'বর্তমান বিশ্বসাহিত্য' প্রবন্ধে — তিনি কেবল লেখালেখির ধরন ও কাজ সম্পর্কে নিজের অবস্থান জানাননি, পক্ষ-বিপক্ষের সুস্পষ্ট মানচিত্রও প্রণয়ন করেছেন। এ ধরনের গদ্যরচনার অনেকগুলোতে তিনি নিজের পরিচয় দিয়েছেন সৈনিক বলে। আর, এ উচ্চারণ যে কেবল কথার কথা নয় তা নিশ্চিত করতেই যেন বা, তৈরি করেছেন সৈনিকতার তাত্ত্বিক গদ্যভাষ্য। *দুর্দিনের যাত্রী* বইয়ের 'আমি সৈনিক' প্রবন্ধকে বলা যায় নজরুলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ইশতেহার।

অনেক পরে, তাঁর কর্মক্ষম জীবনকালের শেষদিকে, 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা' নামের ভাষণে তিনি বলেছিলেন, 'ছেলেদের মধ্যে যেদিন আমি সত্যকার শক্তির পরিচয় পাব সেদিন আমিও হব তাদের সঙ্গের একজন পদাতিক সৈনিক। হে ভগবান, যেন সৈন্যাধ্যক্ষ হবার বাসনা না জাগে' (রচনাবলী ৮ : ৫৫)। ঐ একই পরিচয় দিয়েছিলেন প্রায় দুই দশক আগের বিখ্যাত 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'তে।

> ... আমি তখনই বুঝেছিলাম, আমি সত্য রক্ষার, ন্যায় উদ্ধারের বিশ্ব-প্রলয় বাহিনীর লাল সৈনিক। ... আমি সামান্য সৈনিক, যতটুকু ক্ষমতা ছিল তা দিয়ে তাঁর আদেশ পালন করেছি। ... এবারকার প্রলয় ঘোষণার সর্বপ্রথম আঘাতপ্রাপ্ত সৈনিক মনে করে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেছি।' (রচনাবলী ১ : ৪৩৪)

কিন্তু কর্তব্য পালনের ফর্ম কেবল সৈনিকতা কেন? সেবা নয় কেন? করুণা নয় কেন? কারণ, 'দেশকে যে নারীর করুণা নিয়ে সেবা করে, সে পুরুষ নয়, হয়তো মহাপুরুষ। কিন্তু দেশ এখন চায় মহাপুরুষ নয়। দেশ চায়, সেই পুরুষ যার ভালোবাসায় আঘাত আছে, বিদ্রোহ আছে' (রচনাবলী ২ : ৪১৩)। নজরুল জানেন ও মানেন, দেশের জন্য সেবা দরকার, করুণা দরকার। 'কিন্তু এতে তো দেশের বাইরের মুক্তি স্বাধীনতা আনবে না'। এজন্য দরকার 'আঘাতের দেবতা', 'প্রলয়ের মহারুদ্র'।

এ তো গেল কর্মযজ্ঞের দিক। নজরুলের কাছে তাঁর কর্ম আর সাহিত্যের মধ্যে কোনো ফারাক নাই। তাঁর রচনা কাজ করবে তাঁর কর্মেরই সমান্তরালে। যে সাহিত্যকর্ম করুণার-প্রেমের-সুরের, তা মূল্যবান নিশ্চয়ই। কিন্তু তা 'মুক্ত বিশ্বের' জন্য, 'এ ঘুমন্ত দাস অলস ভারতের' জন্য নয়। এখানকার বাস্তবতায় তিনি আহ্বান করেছেন ভীমের জন্মদাতা পবনকে : 'ফুঁ দাও, ফুঁ দাও এই নিবন্ত অগ্নি-সিন্ধুতে, আবার এর তরঙ্গে তরঙ্গে নিযুত নাগ-নাগিনীর নাগ-হিন্দোলা উলসিয়া উঠুক। ... আঘাত আনো, হিংসা আনো, যুদ্ধ আনো, এদেরে এবার জাগাও, কান্না-কাতর আত্মাকে আর কাঁদিও না'। এরূপ পরিষ্কার নির্দেশনার পর নজরুল ঘোষণা করছেন তাঁর নিয়তি :

> আর্তের অশ্রুমোচন আমার নয়, আমার রণ-তূর্য। আমি প্রলয়ের, আমি প্রেমের নই। আমি রুদ্রের, আমি করুণার নই। আমি সেবার নই, আমি যুদ্ধের। আমি সেবক নই, আমি সৈনিক। (রচনাবলী ২ : ৪১৫)

এ সৈনিক সত্য ও সুন্দরের। এ সৈনিক কর্তব্যের। কর্তব্য কখনো এসেছে দেশ রূপে, কখনো মানুষ রূপে। নজরুল সবসময় কথা বলেছেন এক পরম সত্যের বরাতে, যে সত্য খোদ ভগবান বা পরমেরই গুণ। এ দিক থেকে তাঁর অবস্থান রবীন্দ্রনাথের সমান্তরাল; কিংবা তাঁর নিজের ব্যাখ্যাবিশেষ না থাকায় বলা যায়, এ ধারণা তিনি ধার করেছেন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই। কিন্তু কর্মপদ্ধতি আর সাহিত্যাদর্শে তিনি চিনে নিয়েছেন তাঁর নিজের পাটাতন। উপরের সত্য উপর থেকে নিচের দিকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে সঞ্চালিত হবে — এ ধরনের প্রভাবশালী বুর্জোয়া মডেলের বিপরীতে নিজের কর্মক্ষেত্র স্থির করেছেন নিচের দিকে। 'জনসাহিত্য' শিরোনামের অভিভাষণে (রচনাবলী ৮ : ২৮) পরিষ্কার করে বলেছেন : 'উপর থেকে উপদেশের শিলাবৃষ্টির মতো' লিখলে কাজ হবে না। লিখতে হবে জনভাবের সাথে একাত্ম হয়ে, যথাসম্ভব তাদের ভাষা ও ভঙ্গিতে।

আর কর্মপদ্ধতির দিক থেকে তাঁর আরেক জোরালো প্রস্তাব ভাবকে কাজের উপরে স্থান না দেয়া। 'ভাব ও কাজ' নিবন্ধে লিখেছেন : 'ভাবে আর কাজে সম্বন্ধটা খুব নিকট বোধ হইলেও আদতে এ-জিনিস দুইটায় কিন্তু আসমান-জমিন তফাৎ' (রচনাবলী ১ : ৪১৮)। এ ক্ষেত্রে তাঁর প্রস্তাব, ভাবকে আলাদা না করে করতে হবে বাস্তব কর্মের অধীন।

নজরুল সবসময়ই চেয়েছেন সৈনিক হতে, নেতা নয়। তবে এ সৈনিক নেতার সাক্ষাৎ প্রতিনিধি। এ নেতা যুদ্ধেরই নেতা। নেতা তাঁর কাছে সত্যের পরম মূর্তি। তার বাস্তব মূর্তি না থাকলেও ক্ষতি নাই। কখনো কখনো তা হয়ে ওঠে ঈশ্বরেরই সগোত্র :

> ... আমরা যে আশা করে আছি, কখন সে মহা-সেনাপতি আসবে যার ইঙ্গিতে আমাদের মতো শত কোটি সৈনিক বহ্নি-মুখ পতঙ্গের মতো তার ছত্রতলে গিয়ে 'হাজির হাজির' ব'লে হাজির হবে। হে আমার অজানা প্রলয়ঙ্কর মহা-সেনানী, তোমায় আমি দেখি নাই, কিন্তু তোমার আদেশ আমি শুনেছি, আমি শুনেছি। আমায় যুদ্ধ-ঘোষণার যে তূর্য-বাদনের ভার দিয়েছ, সে ভার আমি মাথা পেতে নিয়েছি। এ যে তোমার হুকুম। সাধ্য কি, আমি তার অমান্য করি? হে আমার অনাগত অব্যক্ত মহা-শক্তি! বাজাও, বাজাও, এমনি করে আমার কণ্ঠে তোমার প্রলয়-শিঙ্গা বাজাও! তোমার রণ-ভেরী আমারই ক্ষীণ কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠুক। ('আমি সৈনিক', রচনাবলী ২ : ৪১৪)

সাহিত্যিক নজরুলের কণ্ঠে এ 'রণ-ভেরী' খুব কার্যকর আর তাৎপর্যপূর্ণভাবেই শোনা গেছে।

৪

সমালোচকরা নজরুলের বিদ্রোহ ও বিপ্লবের মূল সুর এবং আকৃতি ভালোভাবেই শনাক্ত করেছেন। দেখা যাচ্ছে, তাঁর বিদ্রোহ বহুমাত্রিক। রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক দাবি সে বিদ্রোহের একাংশ মাত্র। খুব গভীরতর অর্থে ব্যক্তির মুক্তি এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক যে কোনো জড়তা থেকে একটা সচলতায় উত্তরণ সবসময়ই তাঁর বিদ্রোহের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল। আর বিপ্লব প্রসঙ্গে বলা যায়, বিধিবদ্ধ রাজনৈতিক কর্মসূচির বদলে তাঁর আকাঙ্ক্ষায় ছিল এক ব্যাপক জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিমূর্ত রূপরেখা, যাকে একাট্টা কোনো সূত্রে বেঁধে ফেলা মুশকিল। ফলে নজরুলের বিদ্রোহ ও বিপ্লব একটি নিত্য প্রক্রিয়া, যা চলমান থাকবে প্রস্তুত ব্যক্তিদের প্রাত্যহিক সক্রিয়তায়। এগুলো তাঁর কাছে ভাবগত উপাদানই বটে, কিন্তু কিছুতেই কর্মের বাস্তবতা থেকে আলাদা নয়। তাঁর অন্যতম প্রধান দুই প্রত্যয়ের — বিদ্রোহ ও বিপ্লব — এহেন বিশিষ্টতার কারণেই সৈনিকতা তাঁর সাহিত্যকর্মের অন্তরাত্মার সাথে একাকার হয়ে মিশে গেছে।

৪.১

এই মেশামিশিটা হয়েছে যেমন ব্যক্তির অংশগ্রহণের দিক থেকে, ঠিক তেমনি সামগ্রিক পরিস্থিতির রূপায়ণেও। এক্ষেত্রে সৈনিকতা আসলে একটি ছাড়পত্র। এই পরিচয় নির্দেশ করে একটি যুদ্ধপরিস্থিতি, যেখানে জীবন দেয়া-নেয়া বৈধ, পরিবর্তনের দাবি স্বাভাবিক, সামষ্টিকতা অবশ্যম্ভাবী, উচ্চকণ্ঠ জয়ধ্বনি আর উজ্জীবনী-বাণী সকল পরিবেশের স্বাভাবিক দাবিতেই ন্যায্য। নজরুলের বহু গুরুত্বপূর্ণ কবিতা রূপ পেয়েছে এই ন্যায্যতার ভিত্তিতে।

অগ্নি-বীণা কাব্যের 'রক্তাম্বরধারিণী মা' কবিতায় কবি দেবীর 'দনুজ-দলনী' রূপের পুনরাবির্ভাব কামনা করেছেন। পৌরাণিক বরাতের ব্যত্যয় না ঘটিয়ে বর্তমানের প্রয়োজন অনুযায়ী নির্মিত হয়েছে এই রূপ। কবিতাটি শেষ হয়েছে 'ধ্বংসের বুকে হাসুক মা তোর/ সৃষ্টির নব পূর্ণিমা' — এই আকাঙ্ক্ষায়, যা নজরুলের সাহিত্যকর্মের পৌনঃপুনিক উচ্চারণ। একটু খেয়াল করলেই বোঝা যায়, নজরুল এই কবিতায় দেবীকে সাজিয়েছেন এক সৈনিকের বেশে। সর্বাংশে প্রস্তুত ও সর্বপ্রকারে তৎপর একজন সৈনিকই কেবল আজকের জন্য দরকারি কাজ সম্পন্ন করতে পারে। তাই তাঁর প্রস্তাব :

রক্তাম্বর পর মা এবার
জ্বলে পুড়ে যাক শ্বেত বসন।
দেখি ঐ করে সাজে মা কেমন
বাজে তরবারি ঝনন-ঝন্।

কিংবা, মেখলা ছিঁড়িয়া চাবুক করো মা,
সে চাবুক করো নভ-তড়িৎ,
জালিমের বুক বেয়ে খুন ঝরে
লালে-লাল হোক শ্বেত হরিৎ।

পরের কবিতা 'আগমনী'ও দেবীর আবাহন। এবার সম্পূর্ণ যুদ্ধ পরিস্থিতিতে :

হৈ হৈ রব
ঐ ভৈরব
হাঁকে, লাখে লাখে
ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে
লাল গৈরিক-গায় সৈনিক ধায় তালে তালে
ওই পালে পালে
ধরা কাঁপে দাপে।

এ কবিতায় পূজামণ্ডপের বাদ্য যেন অতীতকালের সুরাসুরের যুদ্ধক্ষেত্রের রণবাদ্যে পরিণত হয়েছে (রফিকুল ১৯৮২ : ৩১১)। তাতে সৈন্যদলের বহুমাত্রিক রণমূর্তি পরিষ্কার পড়া যায়। তার মাঝেই আবির্ভূত হন রণরঙ্গিণী জগতমাতা — হয়ত সৈনিকবেশে, হয়ত সৈন্যদলের নেতা রূপে; কিংবা হয়ত তাঁর একার মহারণেই চিহ্নিত হয় নতুন জমানার নতুন সৈনিকতা।

'কামাল পাশা' কবিতার কথা আগেই বলেছি। এখানে আরো দুই কবিতার কথা তুললাম। 'রণ-ভেরী'র নামও এ সঙ্গেই উচ্চার্য। এসব কবিতা আকার পেয়েছে সার্বিকভাবে যুদ্ধের এবং বিশেষভাবে সৈনিকের রূপে ও কল্পে। অন্য অনেক কবিতায় আংশিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এসব রূপ ও চিত্রকল্প। *চিত্তনামা* কাব্যের 'ইন্দ্র-পতন' কবিতা শুরু হয়েছে যুদ্ধসাজের বর্ণনায় :

আকাশে আকাশে বাজিছে এ কোন ইন্দ্রের আগমনী?
শুনি, অম্বুদ-কম্বু-নিনাদে ঘন বৃংহিত-ধ্বনি।
বাজে চিক্কুর-হ্রেষা-হর্ষণ মেঘ-মন্দুরা-মাঝে,
সাজিল প্রথম আষাঢ় আজিকে প্রলয়ঙ্কর সাজে।

এরপর পুরো কবিতায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে এ বিষয়ক নানা উপাদান। শুধু 'ইন্দ্র-পতন' কেন, ব্যক্তির স্তুতিমূলক যে কবিতাগুলো লিখেছেন নজরুল, তার বেশির ভাগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁর নজরে পড়েছেন তাঁদের সৈনিকসুলভ মনোভাব আর কাজের জন্য, কিংবা নজরুলের উপস্থাপনায় তাঁরা হয়ে উঠেছেন জীবন-বাজি-রাখা সৈনিক। খালেদ তাঁর কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ কেবল এ বৈশিষ্ট্যের মানুষ বলেই। তাঁর পুনর্নির্মাণে খালেদ শুধু মুসলমানদের রণ-ইমাম থাকেন না, হয়ে ওঠেন মজলুম মানুষের সেনাপতি। 'খালেদ' ও 'উমর ফারুক' — উভয় কবিতায় কবি মুক্তির পথ রূপে কামনা করেছেন সশস্ত্র সংগ্রাম (আতাউর ১৯৯৭ : ৮০)।

নজরুলের ইসলামি ঐতিহ্যপ্রধান কবিতায় দেখি 'জুলফিকার' আর 'হায়দরি হাঁক'। ঠিক তেমনি হিন্দু ঐতিহ্যের কবিতায় পাই 'ওঙ্কার ধ্বনি'। দুটোই ব্যবহৃত হয়েছে যুদ্ধের হাঁক হিসেবে। তাঁর কবিতায় ন্যায়ের যুদ্ধে প্রাণদানকারী শহীদের মর্যাদা অন্য যে কারো চেয়ে বেশি; দিলির বা অসম সাহসীও তাঁর কাছে পরম মর্যাদাবান। আর ভীরু ও কাপুরুষরা ঘৃণার পাত্র (রফিকুল ১৯৮২ : ৩০৮)। 'শাত-ইল-আরব' কবিতায় দেখি, স্থানবিশেষকে নজরুল পড়ছেন বহু বীরত্বপূর্ণ জয়গাথার আশ্রয় হিসাবে। অন্য কোনো পরিচয় নয়, তাঁর কাছে ইরাক মূল্যবান হয়েছে 'শহীদের দেশ' হিসাবে। একই রকমের ব্যক্তিত্বখচিত পাঠ পাওয়া যায় তাঁর কোরবানি বিষয়ক কবিতাগুলোতে। *অগ্নি-বীণা* কাব্যের বিখ্যাত 'কোরবানি' কবিতায় তিনি দেখতে চেয়েছেন "হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদ্বোধন"। এই শক্তি — তাঁর কাছে — নিজের জান কোরবান দিতে পারার প্রত্যয়। এ কারণেই অন্যত্র, *ভাঙার গান* কাব্যে, কোরবানির ঈদের নামই তিনি দিয়েছেন 'শহীদী-ঈদ'।

সর্বহারা কাব্যে কয়েকটি কবিতা আছে যেগুলো সামষ্টিক সৈনিকতার জাগরণমন্ত্রে মুখর। এগুলো হলো : 'কৃষাণের গান', 'শ্রমিকের গান', 'ধীবরদের গান' ও 'ছাত্রদলের গান'। এর মধ্যে শেষের কবিতাটি নানা লক্ষণে নিটোল নজরুলীয় রচনা হয়ে উঠেছে। ছাত্র মানে তরুণ; আর তরুণ মানেই — নজরুলের কাছে — একগুচ্ছ সম্ভাবনা, অসম্ভবকে সম্ভব করার তুরীয় আশ্বাস। এ কবিতার আঁটসাঁট শরীরে পরিমিতির নৃত্যপর দোলায় সে সম্ভাবনা আর আশ্বাসের রূপায়ণ ঘটেছে। অন্য তিনটি কবিতার ক্ষেত্রে হয়ত এতটা বলা যাবে না। কৃষক, শ্রমিক আর ধীবরের প্রতিনিধিত্ব করার প্রশ্নে নজরুলের মধ্যবিত্তীয় সীমাবদ্ধতা তো ছিলই। কাব্যিক প্রকাশ হিসাবেও এগুলো সম্ভবত অতটা সফল নয়। তবু কবিতাগুলোর অন্তত তিন ধরনের গুরুত্ব আছে। এক. এগুলো নজরুলের প্রকল্পের বিস্তার নির্দেশ করে। তাঁর জনগণতান্ত্রিক প্রস্তাবে শ্রমজীবী-পেশাজীবী মানুষেরাও অন্তত অংশত অঙ্গীভূত ছিল। দুই. পেশাজীবীদের সামষ্টিকতার মধ্যে তিনি দেখতে চেয়েছেন সামষ্টিক সৈনিকতার উদ্বোধন। তিন. বিশেষ পেশার বাস্তবতা আর অন্তর্নিহিত কর্মগুণকে অক্ষুণ্ন রেখেই তিনি তাঁর কথামালা সাজিয়েছেন। তিন কবিতা থেকে তিনটি ছোট অংশ উদ্ধৃত করা যাক :

ও ভাই আমরা শহীদ, মাঠের মক্কায় কোরবানি দিই জান্।
আর সেই খুনে যে ফলছে ফসল, হরছে তা শয়তান।
(কৃষাণের গান)

আমরা হাতের সুখে গড়েছি ভাই,
পায়ের সুখে ভাঙব চল।
ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল।।
(শ্রমিকের গান)

ঐ চৌদ্দ লক্ষ দাঁড়-কাঁধে ভাই,
মল্লভূমির মল্ল-বীর আয় রে,
ঐ আঁশ-বঁটিতে মাছ কাটি ভাই,
কাটব অসুর এলে!
(ধীবরদের গান)

নজরুলের কবিতায় সামষ্টিকতার প্রতাপের মধ্যেও ব্যক্তি-সৈনিকটি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। আমরা জানি, 'আধুনিকতাবাদী' অর্থে তো নয়ই, এমনকি রোমান্টিক কবিদের মতো করেও নজরুল ব্যক্তিকতাকে প্রশ্রয় দেননি। তা সত্ত্বেও সৈনিক হিসাবে ব্যক্তিকে এতটা পরিসর দেবার কারণ হয়ত এই যে, তিনি চেয়েছেন পৃথকভাবে প্রতিটি মানুষের ভেতরেই বেড়ে উঠবে একেকজন লড়াকু সৈনিক। এতে করে অবশ্য সামষ্টিক অগ্রযাত্রার কোনো ব্যাঘাত ঘটবে না। লক্ষ্য এক হওয়ায় প্রাণের ঔদার্যে তারা মিলবে সমষ্টির ঐকতানে।

৪.২

জীবনের বাস্তব প্রয়োজন এবং কর্তব্যকে সৈনিকের চোখে দেখেছেন বলেই হয়ত নজরুলের সাহিত্যকর্মে গতি, যাত্রা, অভিযান, অগ্রসরতা ইত্যাদির এত অপার মহিমায়ন। অভিযাত্রীর ইমেজ তাঁর লেখায় বারবার এসেছে। এসেছে রক্ত, অগ্নি এবং ঝড়-ঝঞ্ঝার প্রসঙ্গ। এসবকে নজরুল সমর্পিত করতে চেয়েছেন প্রধানত সুরে, যে সুর ভিতর থেকে জাগিয়ে তুলবে ব্যক্তিকে — যাবতীয় জড়তা আর ভিতর-বাইরের বাধা ডিঙিয়ে বের করে আনবে যুদ্ধের ময়দানে। যুদ্ধের প্রচলিত সুরের আবহের মধ্যে পেশল হাতে নিয়ন্ত্রিত শব্দ ও অনুষঙ্গের সুচারু বিন্যাসই আসলে তাঁর *ভাঙার গানসহ* আরো বহু বিস্ময়কর গানের উৎস। দেহে-প্রাণে সে সুর নিত্য না বাজলে শুধু পরিকল্পিত শব্দবয়নে এ ধরনের রচনা সম্ভব নয়। নজরুলের এ ধরনের রচনার মধ্যে — যেগুলো মূলত গান — 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার!' সম্ভবত সর্বশ্রেষ্ঠ। আলবার্ট হলে নজরুলকে দেয়া সংবর্ধনায় সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেন, 'আমি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সর্বদাই ঘুরে বেড়াই। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় জাতীয় সঙ্গীত শুনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু নজরুলের 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু'র মতো প্রাণ মাতানো গান কোথাও শুনেছি বলে মনে হয় না' (উদ্ধৃত, আতাউর ১৯৯৭ : ৬০)। কী আছে এ গানে? আছে নেমে পড়ার উন্মাদনা রক্তে চারিয়ে দেয়ার সুর, আছে দেশের বাস্তব সমস্যাকে আমলে এনে দুর্যোগপূর্ণ রাতের প্রতীকী চিত্রে তাকে প্রকাশের সাফল্য, আছে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জলপথে সামষ্টিক অভিযানের প্রবল প্রত্যয়, আর আছে অতীত সৈনিকদের প্রাণ-বিসর্জনের দৃষ্টান্তসূত্রে নতুন কালের নতুন সৈনিকদের প্রাণদানের আহ্বান। এ ধরনের 'হয়ে যাওয়া' যে-কোনো রচনার নন্দনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নিশ্চয়ই আরো বহুমাত্রিক হতে বাধ্য। আমরা শুধু এখানে স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছি, এসব রচনার ক্ষেত্রে স্রষ্টার মনে যে সুর বেজেছে, আর সৃষ্টিতে যে সুর ফুটে উঠেছে, তার সুলুক সন্ধান করতে গেলে সৈনিক-কবির প্রাণাবেগ আর আকূতির খবরও নিতে হবে।

গানের ক্ষেত্রে সুরের যে কাজ, কবিতার বেলায় ছন্দ খানিকটা সে কাজই করে। বাংলা কবিতার ছন্দের ক্ষেত্রে নজরুলের প্রধান অবদান কী — এ প্রশ্নে সমালোচকদের মধ্যে বিশেষ দ্বিধা দেখা যায়। এর একটা কারণ হয়ত এই, মাত্রা গুনে কবিতার শরীরী তাল-লয় হিসাব করা যায়, অন্তরের দোলা আবিষ্কার করা যায় না — যে দোলা আদতে থিমেরই অন্য নাম। নজরুল বাংলা কবিতায় আমদানি করেছিলেন সম্পূর্ণ নতুন তাল-লয়, একেবারেই নতুন দোলা — সামগ্রিকভাবে যাকে বলতে পারি স্বর ও সুর; আর আমাদের

প্রস্তাব : তাঁর কবিতার সৈনিকবৃত্তিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় আমলে এনেই কেবল ঐ নতুনতার রূপ ও রেখা আঁকা যাবে।

একেবারে শুরুর দিকের 'কামাল পাশা' কবিতা সম্পর্কে 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল : "যুদ্ধের অভিযানের জয়ডঙ্কার তালে তালে যোদ্ধাদের যে জয়োল্লাস এই 'কামাল পাশা' কবিতাটিতে পাই, তাহা এদেশের সাহিত্যে নূতন" (উদ্ধৃত, আজহার ১৯৯৭ : ২৮৪)। একজন সমালোচক খেয়াল করেছেন, 'এই দীর্ঘ কবিতাটি সমিল মুক্তক স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত কিন্তু এ কবিতার প্রকৃত ছন্দ সৈনিকদের চলার ছন্দ, এ ছন্দ এসেছে রণক্ষেত্র থেকে :

লেফ্‌ট্! রাইট্! লেফ্‌ট্!
লেফ্‌ট্! রাইট্! লেফ্‌ট্!

অথবা,

সাবাস জোয়ান্! সাবাস্!
ক্ষীণজীবী ঐ জীবগুলোকে পায়ের তলেই দাবাস্ –' (রফিকুল ১৯৮২ : ৩৩৭)

সৈনিকের চলার ছন্দে আছে বলিষ্ঠ ঋজুতা আর পুনরাবৃত্ত পদাঘাত, যা কবিতার ভারি হলন্ত উচ্চারণের শ্বাসাঘাতে নিষ্পন্ন হয়েছে; আর আছে গতি, যা প্রধানত অতিপর্ব ও খণ্ডপর্বের নিপুণ যোজনায় এবং পরের পঙক্তিকে আগের পঙক্তির সাথে বিরামহীনভাবে উচ্চারণের আভ্যন্তর আবেগের ফল। 'প্রলয়োল্লাস', 'বিদ্রোহী', 'আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে' প্রভৃতি বহু কবিতায় এ বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যাবে। স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তের অপেক্ষাকৃত ছোট পর্বেই এসব বৈশিষ্ট্যের সংস্থান সম্ভব। এ কারণেই হয়ত নজরুলের কবিতায় অক্ষরবৃত্তের প্রতাপ কম। প্রবহমান — অমিল তো নয়ই, এমনকি সমিল — পয়ারও তিনি বিশেষ লেখেননি। প্রবহমান পয়ারের গতি শান্ত, সংযত — ব্যক্তিগত কথকতার ও ধ্যানস্থ স্বভাবের গতি। সামষ্টিকতা-অভিসারী আর দোলায় উত্তাল গতি তৈরির জন্য নজরুল তাই প্রবহমানতা বেছে নেননি, অন্ত্যমিলের শ্রুতিগত তাৎপর্য অক্ষুণ্ন রেখেই অন্য সব কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন। এ মর্মে 'আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে' কবিতাটি পড়া যাক :

আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে
মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগবগিয়ে খুন হাসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে।

এখানে দ্বিতীয় পঙক্তির অতিপর্বটি আসলে প্রথম পঙক্তির ভাঙা পর্বের সাথে মিলে পূর্ণপর্বের আমেজ তৈরি করে। তৃতীয় পঙক্তির বেলায়ও একই কথা খাটে। পরের পঙক্তির অতিপর্বগুলোকে আগের পঙক্তির সাথে মিলিয়ে দেবারও উপায় নাই। কারণ, তাতে অন্ত্যমিল বিঘ্নিত হয়, আর অতিপর্বগুলো স্ব স্ব পঙক্তির সাথে অর্থের বাঁধনে বাঁধা। এভাবে পঙক্তিগুলোর মধ্যে গভীর পারস্পরিকতা তৈরি হয়, যা পরেরটিকে চুম্বকের মতো টেনে আগেরটির সাথে পড়তে বাধ্য করে। তৈরি হয় গতি। অতিপর্বে সুস্পষ্ট বিরাম নিতে হয় বলে প্রবহমান পয়ারের মতো লম্বা লয়ের কোনো অবকাশই থাকে না। শ্বাসাঘাতবহুল স্বরবৃত্তের সাথে এরূপ দ্রুতগতি চলন যুক্ত হয়ে নিষ্পন্ন হয় উল্লাসমুখর পদপাত।

এ কবিতার আরেকটি স্তবক উদ্ধৃত করি :

আসল উদাস, শ্বসল হুতাশ,
সৃষ্টিছাড়া বুক-ফাটা শ্বাস,
ফুলল সাগর দুলল আকাশ ছুটল বাতাস,
গগন ফেটে চক্র ছোটে, পিনাক-পাণির শূল আসে!
ঐ ধূমকেতু আর উল্কাতে,
চায় সৃষ্টিটাকে উল্টাতে,
আজ তাই দেখি আর বক্ষে আমার লক্ষ বাগের ফুল হাসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!

এখানকার প্রথম দুই পঙক্তি আসলে একই পঙক্তির দুই ভাগ। এতে অনুপ্রাসের সাথে পাচ্ছি সবল মধ্যমিল। কিন্তু এক পঙক্তি হিসাবে একে পড়া যায় না; কারণ, তৃতীয় চরণের সাথে তা অন্ত্যমিল সূত্রে যুক্ত। তিন পঙক্তি একত্রে পড়ার পর স্বভাবতই চতুর্থ পঙক্তির আবেগ তৈরি হয়। একই তালে পড়তে হয় পরের চারটি পঙক্তিও, যেহেতু সুস্পষ্ট স্বাধীন অতিপর্ব বিরামহীনভাবে সেগুলো উচ্চারণে বাধ্য করে। লম্বা ও ছোট পঙক্তির সমানুপাতিক বিন্যাস গতি নিশ্চিত করার আরেকটি কার্যকর উপায়। প্রচলিত স্বর ও মাত্রাবৃত্তের আত্মায় এরকম আরো অনেক উপাদান যোগ করে নজরুল সম্পন্ন করেছেন সামষ্টিক গতিশীলতার সুর ও স্বর, বিজয়-উন্মুখ বা বিজয়-উন্মত্ত সৈন্যদলের চলনের সাথেই যার তুলনা করা চলে। এটাই হয়ত বাংলা কবিতার ছন্দে নজরুলের প্রধান অবদান।

নজরুল তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো কবিতা-গানে এই সুরের অধীনেই শব্দ সঞ্চয় করেছেন। অর্থের তুলনায় সুরই সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে। সুরের উচ্চ নিনাদে বীররসের সংগতি রক্ষার খাতিরে তিনি আমদানি করেছেন বাংলা কবিতার নতুন শব্দস্বভাব, যা 'বাংলা কবিতার বহুদিনকার অলস শব্দসুষমার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ' (সৈয়দ ১৯৯৩ : ৮)। সৈয়দ আলী আহসান আরো লিখেছেন, 'শব্দকে কাজী নজরুল ইসলাম একটি প্রবল স্রোতধারার প্রবাহের মতো ব্যবহার করেছেন যে ভঙ্গিকে ইডিথ সিটওয়েল পর্বত-শিখর থেকে নিম্নভূমিতে গড়িয়ে পড়ার ভঙ্গি বলে আখ্যাত করেছেন। একটি প্রবল প্রবাহে যেমন কোনো বিশেষ অঞ্চল অথবা উপলখণ্ড অথবা ভঙ্গুর তরঙ্গচূর্ণ কোনোটাই বিশেষভাবে চোখে পড়ে না, চোখে পড়ে শুধু একটি তীব্র যাত্রা, তেমনি নজরুল ইসলামের *অগ্নি-বীণায়* কোনো বিশেষ শব্দ, কোনো চরণ অথবা কোনো স্তবক বিশেষ মূল্য লাভ করেনি। বিচ্ছিন্নভাবে কোনোটাই আমাদের শ্রুতিগোচর অথবা নয়নগোচর হয় না। কিন্তু প্রতিটি কবিতায় স্রোতধারার মতো একটি প্রবল গতি আমরা লক্ষ করি। একটি কবিতায় সমগ্রভাবে এ গতিটি আমাদের শ্রুতি এবং অনুভূতিতে জাগে' (সৈয়দ ১৯৯৩ : ৯)। নজরুলের কবিতার শব্দস্বভাব, গতি ও সুর সম্বন্ধে এ এক অন্তর্ভেদী অবলোকন। তবুও আমরা এ ব্যাপারে একটু ভিন্ন প্রস্তাব করতে চাই। পাহাড়ি নদীর স্রোতধারার বদলে দুরন্ত সৈনিকদলের অগ্রযাত্রার উপমায় পড়লে তাঁর কবিস্বভাবের অধিকতর কাছাকাছি পৌঁছানো যাবে বলে আমাদের ধারণা। সৈনিকদলের চলার পথ পূর্বনির্ধারিত বা অভ্যস্ত শাসনে বাঁধা থাকে না। প্রতিমুহূর্তের বিচিত্র প্রয়োজনে তাদের সাড়া দিতে হয়। কিন্তু সর্বাবস্থায় সামষ্টিক ঐকতান আর তেজোদীপ্ত গতিটি বলবৎ থাকে। এই সামষ্টিকতা আর তেজের কথা মাথায় রাখলে

বোঝা যাবে, আমাদের প্রস্তাব একই বস্তুর অন্য নামায়ন মাত্র নয়। মুজফ্‌ফর আহমদের কথা থেকে ব্যাপারটা আরো পষ্ট হবে। তিনি লিখেছেন : 'আমাদের বাঙলা ভাষা চিরদিন নজরুল ইসলামের নিকট ঋণী থাকবে। আমাদের ভাষা মিষ্ট। আমাদের ভাষা সুকোমল। শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতা আমাদের ভাষায় রচিত হতে পারে এই ছিল আমাদের ধারণা। আমাদের ভাষায় জোর নেই, সংগ্রামশীলতা নেই, এই ধারণা আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল ছিল বলেই আমরা শ্লোগান দিতাম হিন্দুস্থানিতে। নজরুল ইসলামের অভ্যুদয়ের পর আমরা বুঝেছি যে, বাঙলা ভাষাও জোরালো, সংগ্রামশীল ও অসীম শক্তিশালিনী। ... নজরুলের সামরিক শিক্ষা ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা মিশে যাওয়ায় তার কলম হতে এত জোরালো ভাষা বের হওয়া সম্ভব হয়েছে'। (সংকলিত, মোহাম্মদ ১৯৯৯ : ৯৭)

৫

নজরুলের রচনার গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ এখানে আমরা পড়লাম সৈনিকতাকে কেন্দ্রে রেখে। প্রভাবশালী বুর্জোয়া নন্দনতত্ত্বের প্রায় যে কোনো ধারা অবলম্বন করেও কাছাকাছি সব সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে। তাতে বাদ পড়ে যাবে তাঁর রচনার একেবারে গোড়ার সত্য — ভাবকথা ও তৎপরতাকে একসাথে মিলানোর সাধনা। মুজফ্‌ফর আহমদের শনাক্তিতে নজরুল সাহিত্যের এই মর্মকথাটি সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। নজরুলকে বাদ দিয়ে পরবর্তী প্রজন্মের 'আধুনিক' কবিদের বেশি মর্যাদা দিয়েছেন যেসব সমালোচক, তাদের ইঙ্গিত করে তিনি লিখেছেন, 'সংগ্রামের স্থান হতে সর্বদা বহু যোজন দূরে থাকা ও গায়ে আঁচড়টি লাগতে না দেওয়া এবং স্বাধীনতা অর্জিত হলে তার ফল পুরোপুরি ভোগ করাই তাঁদের মতে বিশুদ্ধ কবির লক্ষণ। নজরুল ইসলামের সঙ্গে এই সমালোচকদের কোথাও মিল নেই। নজরুল সমাজের রূপান্তর ঘটাতে চেয়েছে, আর এই সমালোচকরা যে কবিদের সমর্থক তারা চলতি সমাজব্যবস্থার আকৃতিতে নিজেদের গড়ে নিতে চেয়েছেন' (সংকলিত, মোহাম্মদ ১৯৯৯ : ৯৪)। তাই সমাজ-রূপান্তরে তৎপর একজন সৈনিকের ভাবকথা হিসাবেই নজরুল রচনাবলির সর্বোত্তম পাঠ সম্ভব।*

সহায়ক রচনাপঞ্জি

আজহারউদ্দীন খান, ১৯৯৭, *বাংলা সাহিত্যে নজরুল*, সুপ্রীম পাবলিশার্স, কলকাতা
আতাউর রহমান, ১৯৯৭, *নজরুল কাব্যসমীক্ষা*, ৫ম সংস্করণ, শুভ্রা প্রকাশনী, ঢাকা
আবদুল কাদির, ১৯৮৯, *নজরুল প্রতিভার স্বরূপ*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা
কাজী নজরুল ইসলাম, ২০০৬, *নজরুল-রচনাবলী*, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
মাহবুব হাসান, ১৯৯৭, *নজরুলের রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা
মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, ১৯৮৩, *সমকালে নজরুল ইসলাম*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, ১৯৯৯, *নজরুল সমীক্ষণ*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা
রফিকুল ইসলাম, ১৯৮২, *কাজী নজরুল ইসলাম* : জীবন ও কবিতা, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা
শেখ দরবার আলম, ১৯৮৮, *অজানা নজরুল*, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা
সৈয়দ আলী আহসান, ১৯৯৩, *আধুনিক বাংলা কবিতা : শব্দের অনুষঙ্গে*, শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা

* নিবন্ধটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নজরুল গবেষণা কেন্দ্র' আয়োজিত ১২ মার্চ ২০১১ তারিখের সেমিনারে পঠিত।